

মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়ছয়

■ সাকিব নেওয়াজ ও ফসিহ উদ্দীন মাহতাব রাজধানীর বেসরকারি ইন্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে 'মুক্তিযোদ্ধার সন্তান' হিসেবে আর্থিক সুবিধা (স্কলারশিপ) পাওয়ার আবেদন করেছিলেন যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার যাদবপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা শেখ মো. আবদুর রাজ্জাকের সন্তান। তার পিতার মুক্তিবর্তা নম্বর-০৪০৫০২০০৭০, সনদ নং-ম ৬৪৪১৮। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়মানুযায়ী ছাত্রের পিতার মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাইয়ের জন্য গত বছরের ১২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে পত্র পাঠায়। কিন্তু ১১ মাস পেরিয়ে গেলেও ইন্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কোনো উত্তর পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবারও চিঠি পাঠিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে। এ রকম আরও কয়েক শিক্ষার্থীর পিতার সনদ যাচাইয়ের জন্য কয়েকবার পত্র পাঠিয়ে এখনও সাড়া পায়নি এই বিশ্ববিদ্যালয়। কবে সনদ যাচাই শেষ হবে তা-ও জানেন না তারা। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে এই শিক্ষার্থীরা শেষ পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা (স্কলারশিপ) পাবেন কি-না তা এখন অনিশ্চিত। তবে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এই শিক্ষার্থীরা সনদ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতার কারণে আর্থিক অনুদান

সনদ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতা

(স্কলারশিপ) থেকে বঞ্চিত হলেও থেমে নেই ভূয়া সনদ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ঘটনা। অর্থনৈতিক অনিয়ম করে অনেকেই ভূয়া সনদ সংগ্রহ করে শিক্ষাজীবন শেষ করছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ঘটছে এ রকম ঘটনা।

সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য ভর্তির ৫ শতাংশ কোটা, স্কলারশিপসহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা অনিয়মের মাধ্যমে গ্রহণ করার প্রবণতা বেড়েছে। বেড়েছে সনদ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতা।

এ ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এ হান্নান সমকালকে বলেন, এমন অসংখ্য আবেদন প্রতিদিন আসছে। এ মুহূর্তে ১০-১২ হাজার আবেদন জমে আছে। অথচ মন্ত্রণালয় তীব্র জনবল সংকটে আছে। এ কারণে সনদ যাচাইয়ের কাজ দ্রুতগতিতে করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, টাকা-পয়সা লেনদেনের কোনো অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।

সরকারের নির্দেশনামতে প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের টিউশন ফি

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মওকুফ করা হয়। এ জন্য আবেদনও চাওয়া হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে বলা হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাইয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। নিয়ম অনুযায়ী ১৫ দিনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাই শেষ করার কথা। এরপর তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানাতে হবে। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সনদ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হচ্ছে না। এ কারণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তদবির করছেন। এরপর 'হয়তো' 'সনদ'ও পাচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সেকশনের কতিপয় অসাধু কর্মচারীর অসহযোগিতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে এ অবস্থা। তদবির ও অর্থ ছাড়া ফাইল নড়ছে না। তাই অনেক অভিভাবকই অর্থকড়ি দিয়ে সনদ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে আবার ভূয়া সনদ সংগ্রহ করছেন।

ঘটনাস্থল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

: চলতি বছর কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধার ভূয়া সনদ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় এক ছাত্র ভর্তির অভিযোগ উঠেছে। সাকিব আহমেদ নামের ওই শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন ইংরেজি বিভাগে। ইবি রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানা যায়, ১২ জানুয়ারি বিশেষ মুক্তিযোদ্ধা কোটার ফল প্রকাশ করা হয়। মেধা তালিকায় মোট ৮৫ জনকে রেখে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। দেখা যায় বি ইউনিটে ১৮-৭৭ রোলধারী সাকিব আহমেদ মেধা তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছেন। তার বিশেষ কোটার রোল নম্বর ৭৭। তাকে ইংরেজি বিভাগে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক অভিযোগের ভিত্তিতে খোজ নিয়ে প্রাথমিকভাবে জানতে পারে, সাকিব আহমেদ মুক্তিযোদ্ধার যে সনদ দিয়ে ভর্তি হয়েছেন, সেটি ভূয়া। তার বাবার নাম আজিজুর রহমান। কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন

করেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশেষ কোটার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান বলেন, অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায়ও এ রকম ঘটনা ঘটে। ওই বছর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ফলাফলে প্রথম হন শিক্ষার্থী সাঈদুর রহমান। পরে খোজ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানতে পারে, ওই ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নন। ওই ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার যে সনদপত্র জমা দেন, তাতে তার পিতার নাম মশিয়ার রহমান মোল্লা। অথচ তার এসএসসি, এইচএসসিসহ সব ধরনের সনদ ও কাগজপত্রে তার পিতার নাম মশিউর রহমান লেখা আছে। তা ছাড়া ওই রোল নম্বরে যে ছাত্র আইন ও শরিয়াহ অনুষদভুক্ত এইচ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দেন, তিনি এবং ভর্তি হওয়া ছাত্র এক নন। তাদের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ছবিও পৃথক। অন্য ছাত্রকে দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এবং কিছুটা মিল থাকা মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র সংগ্রহ করে তিনি ভর্তি হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা কোটায়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই ভর্তি বাতিল করে।

ভূয়া ঠেকাতে ইবিতে উপ-কমিটি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার সমকালকে জানান, ভূয়া সনদ ব্যবহারকারীদের শনাক্ত করতে তারা এখন একটি কৌশল নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রথমে শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি পরে একজন প্রতিনিধি নির্ধারণ করে। যিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এ সংক্রান্ত বই 'লাল মুক্তি বার্তা' ও মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গেজেট নিরীক্ষণের মাধ্যমে সনদগুলোর সত্যতা যাচাই করেন।'

অনিয়ম : মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কেলেকারি ঘটেছে জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত বছরেও এখানে এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নন এমন ছাত্রীকে প্রায় চার লাখ টাকার বিনিময়ে ভূয়া সনদ তৈরি করে ভর্তি করান। এ ঘটনা পরে ফাঁস হয়ে যায়। শিক্ষা শাখার ওই উর্ধ্বতন সহকারী কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন এক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের নাম কৌশলে বাদ দিয়ে ভূয়া সনদের মাধ্যমে গত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের (৪৩তম ব্যাচ) প্রথমতম বিভাগে উম্মে সুলতানা (শিখা) নামের এক ছাত্রীকে ভর্তি করান। ওই ছাত্রীর কাছ থেকে তিনি ৩ লাখ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা নেন।

এর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়েই নৃবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে একই পদ্ধতিতে ভর্তি করা হয়। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ৪২তম ব্যাচে জান্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে ভূয়া সনদের মাধ্যমে ভর্তি করানো হয়। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ৪০তম ব্যাচে দর্শন বিভাগে ভূয়া সনদের মাধ্যমেও এক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। পরে এসব ভর্তি বাতিল হয়।

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সমকালকে জানান, ভর্তির পর সাধারণত সনদ যাচাই শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সনদ যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়। এরপর চলে দীর্ঘসূত্রতা। অনেক সময় জাল সনদ ধরা পড়ে। দেখা যায়, সনদে থাকা পিতার নাম নেই সরকারি গেজেট ও 'মুক্তিবর্তা' (লাল বই) তালিকাতেও। তবুও ওই শিক্ষার্থীরা কেউ এক বছর, কেউ দু'বছর ধরে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। রেজিস্ট্রাররা জানান, এ অবস্থার অবসান দরকার।